দশম সংখ্যা

রূপকথা

বাংলা ভাষাকে জীবিকার ভাষা করে তুলুন

জানা অজানা নেতাজি

চেনা মুখ
প্রিয়রঞ্জন

স্মরণ
বিরজু মহারাজ

সম্পাদকীয়

নেতাজির আত্মত্যাগ জন্ম জন্মান্তরেও ভোলার নয়

রমজানের মতো বড়ই পবিত্র বছরের প্রথম এই মাস। এই জানুয়ারিতেই দুই মহান পুরুষের জন্মবার্ষিকী। মাসের প্রথমে যখন সকলের প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস, মাসের শেষার্ধে দেশনায়ক নেতাজির জন্মজয়ন্তী। একজনের বাণী যদি হয় জীবনের সঠিক পথে এগিয়ে চলার পাথেয়, তাহলে আরেকজন বাঙালির আবেগ। ইতিহাস সাক্ষী আছে, সুভাষের মনের মাঝে ভেসে ওঠা স্বামী বিবেকানন্দের ছবিই ছিল তাঁর প্রেরণা। স্বামীজির বাণী বুকের মাঝে নিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন প্রাণশক্তি। তাতেই তাঁর এতদূর এগিয়ে চলা। দু'চোখে তাঁর স্বাধীনতার স্বপ্ন। ভারতের স্বাধীনতা। এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ব্রিটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দেশের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার আগে বলেছিলেন, " হে মহাপ্রাণ, শক্তি দাও। এই বিরাট কাজের ভার বইবার শক্তি দাও।"দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্য নেতাজির আত্মত্যাগ, সংগ্রাম, সংযম, কর্মোদ্দীপনা, লড়াই জন্ম-জন্মান্তরেও ভোলার নয়। সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন যেন এক অসম্পূর্ণ উপন্যাস। তাঁর জীবনের অনেক কথা জেনেও আমরা অনেক কিছুই জানিনা। স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে আজও নেতাজির অন্তর্ধান রহস্যের কিনারা হল না। নেতাজি সংক্রান্ত সবকটি গোপন ফাইলও প্রকাশ হয়নি।১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট। গোটা দেশবাসীর কাছে অন্ধকারময় দিন। তাইওয়ানের তাইহোকু বিমান বন্দরে বিমানে ওঠার আগে শেষবার নেতাজিকে দেখা গিয়েছিল। এরপর থেকে তাঁর আর খোঁজ মেলেনি। নিয়ে অনেক বিতর্ক, অনেক দাবি, যুক্তি-পাল্টা যুক্তির ঝড় উঠেছে। আজও সেই রহস্য উন্মোচন হয়নি।

সূচিপত্র

অপরাজেয় নেতাজি	৩-৪
নেতাজির মুসলিম সঙ্গী	৫-৬
মোদীর মোক্ষম চাল	৭-৮
নেতাজির জন্য গান	৯
নেতাজির প্রিয় তেলেভাজা	১০
স্যালুট প্রিয়দা	১১
চিত্রা সিনেমা	১২
বাংলার দুই বসু	১৩-১৬
সাহেবি পোশাক	১৭-১৮
নেতাজির কাহিনী	১৯
দাদা ঠাকুর	২০
নেতাজি ও রানি ঝাঁসি	২১
সত্যজিৎ রায়	২২-২৩
কবিতা	২৪-২৫
ঐতিহাসিক নিলাম	২৬

রূপকথা

প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক

মানসকুমার ঠাকুর

নির্বাহী সম্পাদক

সৈকত হালদার

সহ-সম্পাদক - ঈপ্সিতা সেন

সহযোগী - মধুমিতা দাস

পরিচালনা

মানসী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

অক্ষরবিন্যাস	প্রচ্ছদ
ইন্দ্রবুবলি	**কুন্তল**

অপরাজেয় নেতাজি

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজও আমাদের কাছে বিস্ময়কর ও অনুপ্রাণিত, বীর যোদ্ধা। তাঁর আদর্শ চেতনায় ভারতবাসী মুগ্ধ। দেশপ্রেমিক ছাড়াও তাঁর চরিত্রে ছিল নানা বর্ণময় দিক। নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর নানা দিক নিয়ে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

স্বামীজির যে কবিতা পড়ে নেতাজি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন

স্বনাম গুপ্ত

১৮৯৮ সালে আলমোড়ায় থাকার সময় পাওহারি বাবার হোমের আগুনে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগের খবর ও প্রিয় শিষ্য গুডউইনের টাইফয়েডের মৃত্যু সংবাদে বিচলিত স্বামী বিবেকানন্দ ১২ জুন নিবেদিতা-সহ কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে দ্বিতীয়বার কাশ্মীর যান। উদ্দেশ্য ছিল শ্রাবণী পূর্ণিমায় অমরনাথ দর্শন করা। কিন্তু পহেলগ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করার পর পথে নানাভাবে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা স্বামীজিকে বিদেশিনী-সহ অমরনাথ যাত্রায় বাধা দেন। স্বামীজি দৃঢ় যুক্তির দ্বারা ও নাগা সন্ন্যাসীদের সমর্থনে সব বাধা দূর করে ২ আগস্ট অন্তিম ছাউনি থেকে অমরনাথের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। খাড়াই পথে ওঠার ক্লান্তি ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য সঙ্গীদের থেকে তিনি পিছিয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু অমরনাথ গুহার কাছে পৌঁছেই লিডার নদিতে স্নান করে প্রায় নিরাবরণ দেহে দণ্ডিকেটে গুহা মুখ প্রদক্ষিণ করে গুহার মধ্যে ঢুকে অনেকক্ষণ পুজো ও ধ্যান করেন। গুহা থেকে বেরিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল তিনি দশাশিবের পাদস্পর্শ করেছেন। এরপরে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর এতটাই খারাপ হয়েছিল যে একজন ডাক্তার বলেছিলেন স্বামীজির হার্ট থেমে যেতে পারে। তবে

মাতৃরূপা মাতা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ স্পন্দিত, ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ্য-বায়-বেগে লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরান বহির্গত বন্দীশালা হতে মহাবৃক্ষ সমুলে উপাড়ি ফুৎকারে য়ড়ায়ে চলে পথে সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি নভস্তল পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায় লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখ রাশি জগতে ছড়ায়- নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয় করালী করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপে প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে! কালী, তুই প্রলয় রূপিণী আয় মাগো আয় মোর পাশে সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়- মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে কাল নৃত্য করে উপভোগ-মাতৃরূপ তারি কাছে আসে।

এই ঘটনার পর তাঁর হার্টের আয়তন বেড়ে যায়। এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্বামীজিকে প্রায় ৩ মাস শ্রীনগরে থাকতে হয়েছিল। অমরনাথ দর্শনের কিছুদিন আগে ও পরে স্বামীজির মন শিবভাবে বিভোর ছিল। আচমকা কোনো অজ্ঞাত কারণে স্বামীজির মন কালীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। ওই সময় তিনি হাউসবোটে সব সময় রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতগুলো গাইতেন। মা ভবতারিণীর জন্য মন আকুল হওয়ায় তিনি কাউকে কিছু না বলে বজরা ছেড়ে ক্ষীরভবানী মন্দিরে আসেন। মন্দিরের সামনে থাকা চিনার গাছের নীচে বসে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত ৭ দিন তপস্যা ও মায়ের পুজো করেন। বজরা ছাড়ার আগে প্রচণ্ড আবেগে তিনি 'কালী দ্য মাদার' কবিতাটি লিখে বজরায় রেখে আসেন। তাঁর এক চিকিৎসক অসুস্থ স্বামীজিকে দেখতে এসে এই কবিতাটি পান ও নিবেদিতাকে দেন। শোনা যায়, মন্দির থেকে ফিরে এসে স্বামীজি কয়েকদিন একা বজরায় ধ্যানে বিভোর ছিলেন। একদিন নাপিত ডেকে মাথা ন্যাড়া করে কবিতাটি পড়তে-পড়তে বলেন, 'এর প্রত্যেকটি কথা সত্য'। বরদা স্টেটে চাকরি করার সময় অরবিন্দ ঘোষ এই কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হন। বিপ্লবী অরবিন্দ থেকে ঋষি অরবিন্দ হওয়ার পেছনে এই কবিতাটির অবদান রয়েছে। তাঁর আত্মজীবনীতে একথা স্বীকার করেছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্রেরও কবিতাটি খুব প্রিয় ছিল। মহানিষ্ক্রমণের আগে বারবার এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন বলে শোনা যায়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।

সেই অনুবাদটি এখানে তুলে ধরা হল।

বাংলার ইতিহাসে সেভাবে লেখা হয়নি

নেতাজির মুসলিম সঙ্গী-সাথীরা

জামিতুল ইসলাম

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন জাতপাতের উর্ধ্বে। ধর্ম নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। তাঁর জীবনে নানাভাবে মুসলিমরা জড়িয়ে ছিলেন।

নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করে মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ওই বছরের ১৪ আগস্ট মণিপুরের মৈরাং-এ ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেন কর্ণেল শওকত আলি মালিক। তাঁর সাহসিকতার জন্য তিনি নেতাজির কাছ থেকে 'সর্দার-ই-জঙ্গ' উপাধি পান। এত কিছুর পরেও তাঁর নাম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এমনকী মৈরাং-য়ের কাংলাতে পরবর্তীকালে যে ফলক লাগানো হয়েছে, তাতেও কর্ণেল শওকত আলি মালিকের নাম রাখা হয়নি! এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে। শুধু তাই নয়, নেতাজির উত্তরসূরি বলে দাবি করা ফরওয়ার্ড ব্লক দলটি সোনকারে একটি মিউজিয়ামের সামনে ফলক লাগায়, তাতেও মালিকের নাম নেই।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার সময় এভাবে মুসলিম নামগুলো সযত্নে এড়িয়ে যায় সিলেবাস তৈরির বিশিষ্টরা। আসলে নেতাজির সঙ্গে মুসলিম যোগ তাঁর জীবন জুড়েই ছিল। সারা জীবনে, বিশেষ করে যুদ্ধের ওই সময়টাতে তিনি তুমুলভাবে মুসলিম সৈনিকদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের ৪০ শতাংশ সেনাই ছিল মুসলিম। তিনি যখন ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ছদ্মবেশে ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান তখন তিনি 'বোবা' পাঠানের ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। নাম নিয়েছিলেন মহম্মদ জিয়াউদ্দিন।

এরপর আসছি আবিদ হোসেনের কথায়। আবিদ হোসেন ছিলেন 'জয় হিন্দ' ধ্বনির প্রকৃত স্রষ্টা। তিনি ছিলেন হায়দরাবাদের মানুষ। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে জার্মানি যান। সেখানে নেতাজির বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে পড়া ছেড়ে দিয়ে নেতাজির সঙ্গে যোগ দেন। তিনি ছিলেন নেতাজির সর্বক্ষণের সঙ্গী। সাবমেরিন করে জার্মানি থেকে জাপান যাওয়ার পথেও আবিদ হোসেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৮৪ সালে আবিদ হোসেন মারা যান। জয় হিন্দ ধ্বনিগুচ্ছ

পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পার্লামেন্টে তাঁর সেই বিখ্যাত মধ্যরাতের বক্তব্যে ব্যবহার করেন।

হবিবুর রহমান, কর্ণেল আশরাফুদ্দিন চৌধুরী, কর্ণেল এস আখতার আলি, কর্ণেল আহমউদ্দিন, কর্ণেল তাজউদ্দিন প্রমুখ ছিলেন নেতাজির খুব কাছের সহকর্মী। রেঙ্গুনে গঠিত আজাদ হিন্দ সরকারের ক্যাবিনেট সদস্যের মধ্যে ছিলেন- লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আজিজ আহমেদ ও এহসান। নেতাজির প্রধানমন্ত্রিত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছিল তাতে সচিবদের মধ্যে ছিলেন করিম খান, ডি এম খান। আজাদ হিন্দ ফৌজের চারজন কমান্ডারের মধ্যে তিনজন ছিলেন মুসলিম-মেজর জেনারেল মহম্মদ জামান কিয়ানি, শাহনওয়াজ খান ও শওকত আলি মালিক। পরে আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন সৈনিকদের বিচার হয়। বিচারে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। দেশের মানুষের তীব্র প্রতিবাদে তা রদ হয়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরে শাওনওয়াজ খান বেশ কয়েকটি দফতরের মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব সামলান।

নেতাজিকে সাহায্যকারী আরেকজন মুসলিম হলেন আব্দুল হাবিব ইউসুফ মার্ফানি। তিনি ছিলেন রেঙ্গুনবাসী ধনী মুসলিম ব্যবসায়ী। নেতাজি তখন আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য টাকা জোগাড় করছিলেন। আব্দুল হাবিব ইউসুফ এক কোটি টাকা ও প্রচুর সোনার গয়না ফৌজের তহবিলে দান করে দেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। নেতাজি তাঁকে 'সেবক-ই- হিন্দ' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর এই ত্যাগের কথা ক'জন ভারতীয় মনে রেখেছে!

সবশেষে আর একজনের কথা উল্লেখ করব। তিনি হলেন কর্ণেল নিজামুদ্দিন। মায়ানমারের (তখন বার্মা) জঙ্গলে নেতাজিকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এই নিজামউদ্দিন। তিনটে বুলেট নিজের বুক পেতে নিয়েছিলেন, নেতাজিকে রক্ষা করতে। তাঁর বীরত্ব দেখে নেতাজি তাঁকে 'কর্ণেল' উপাধি দেন। নিজামুদ্দিনের আসল নাম ছিল সাইফুদ্দিন। তাঁর জন্ম হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে। ২০ বছর বয়সে তিনি ব্রিটিশ আর্মির হয়ে লড়াইয়ের জন্য কলকাতায় আসেন। এরপর এক ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে সিঙ্গাপুর পালিয়ে যান। সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যোগ দেন। টেলিগ্রাফ পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিজামউদ্দিন ওই জঙ্গলের ঘটনাটি বর্ণনা করেন, 'আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। নেতাজি ছিলেন, পাশে আমিও ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ করে ব্যারেলের গর্জন শুনি। তৎক্ষণাৎ নেতাজির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এরপর আমার আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল দেখি নেতাজি আমার পাশে দাঁড়িয়ে। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহগল আমার শরীর থেকে বুলেট বের করেছিলেন।'

এটা ১৯৪৩ সালের ঘটনা। তিনি সব সময়ে নেতাজির পাশেই থাকতেন। ড্রাইভার হিসাবে কাজ করতেন। যুদ্ধ পর্ব শেষ হলে তিনি রেঙ্গুনে থেকে যান। তাঁর ছেলে-মেয়েরা সেখানে জন্মায়। ১৯৬৯ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। বসবাস শুরু করেন নিজের গ্রামে। বাড়ির নাম রাখেন 'হিন্দ ভবন'। ছাদে উড়ত জাতীয় পতাকা। কারোর সঙ্গে দেখা হলে 'জয় হিন্দ' বলে সম্বোধন করতেন কর্ণেল নিজামউদ্দিন। ২০১৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ১১৭ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

মোদীর মোক্ষম চাল, প্রজাতন্ত্রে নেতাজি

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবের সঙ্গে নেতাজির জন্মদিন জুড়ে দিয়ে মোক্ষম চাল দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে সমালোচকরা বলেন, মোদীর নেতাজি বন্দনা আদতে ভণিতা। মিথ্যা আর ছলাকলার ওপর তাঁর সিংহাসন। কেননা, যে স্কুল অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) থেকে মোদীর উত্থান, তারা কোনোদিনই সুভাষ চন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধাভক্তি করত না। বিশ্বাস করত না নেতাজির রাজনৈতিক ভাবাদর্শে। পরন্তু তারা নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের এবং নেতাজির স্বাধীনতা আন্দোলন প্রক্রিয়াকে পেছন থেকে ছুরি মেরেছিল। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাঙালি তরুণ সুভাষ চন্দ্র বসু। সেই সময়ই আরএসএস নেতা সাভারকার প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন, হিন্দুদের এগিয়ে আসতে হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজকে রুখতে হিন্দুদের ব্রিটিশ সেনায় নাম লেখাতে হবে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ'কে 'সুযোগ' হিসেবে কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েই থেমে থাকেননি তিনি, ময়দানে নেমে পড়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সেই সময় 'নিয়োগ শিবির' খোলা হয়েছিল। প্রচুর হিন্দু নাগরিককে ব্রিটিশ সেনায় নাম লেখানো হয়েছিল, যারা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসা আজাদ হিন্দ ফৌজকে আটকানোর প্রস্তুতি নিয়েছিল। আরএসএসের সেই উদ্যোগ সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীকে আটকাতে ব্রিটিশের সহায়ক প্রমাণিত হয়েছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর বহু সেনাকে হত্যা করেছিল সেই সেনাদল। সেই আরএসএসজাত প্রধানমন্ত্রী যখন জাঁকিয়ে ভারত জুড়ে আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫তম বছর পালন করে সেই উপলক্ষে ২০১৮ সালে প্রথা ভেঙে একই বছরে দ্বিতীয়বার লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তখন তা এক জাতীয় প্রতারণা। ওটা কোনও নেতাজি প্রেম নয়। কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়ার অন্যতম পদক্ষেপ মাত্র। ঠিক এবছর যেমন, প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানকে এগিয়ে ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনের সঙ্গে মার্চ করিয়ে দিলেন, তাও এক রাজনীতি। ৫টি রাজ্যে ভোটের আগে নেতাজি ভাঙিয়ে ঘর গুছোনোর আয়োজন।

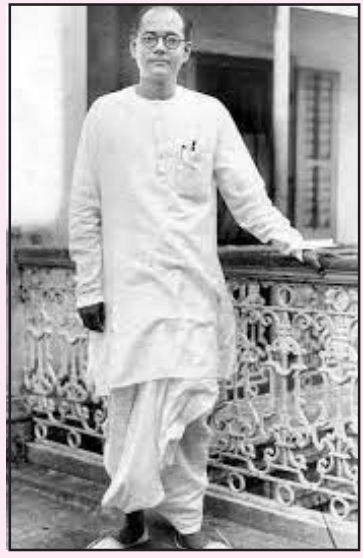

নরেন্দ্র মোদী ভাবটা এমন করেন, যেন ভারতের স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের কংগ্রেস নেতাদের কংগ্রেসই সম্মান দেয়নি। তাই তাঁর সরকার ওই নেতাদের সম্মান জানাচ্ছে ও গৌরব-গাঁথা তুলে ধরছে। ভারতীয় জনতা পার্টি লাগাতার প্রচার করে চলে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেহরু ও গান্ধী পরিবারের ভূমিকাকে গৌরবান্বিত করতে গিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব সুভাষ চন্দ্রের কৃতিত্ব ও অবদানকে আড়াল করে

রেখেছে। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই, এই অভিযোগের মধ্যে কিছুটা সত্য আছে, তবেও আমাদের প্রশ্ন ভোট রাজনীতির বৈতরণী পার হতে চাওয়া ছাড়া আর কোন কাজে বিজেপি নেতাজিকে অনুসরণ করে? বিজেপির রাজনৈতিক গুরু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রাজনীতির সঙ্গে নেতাজির তিলমাত্র মিল নেই। এমনকী, জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালীন সুভাষ সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লিগের মতো সংগঠনগুলির সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে প্রস্তাব পাশ করান। এমনকী,

১৯৪০ সালের ৪ মে ফরওয়ার্ড ব্লকের কাগজে 'কংগ্রেস এবং সাম্প্রদায়িক সংগঠন' শিরোনামে সুভাষ সম্পাদকীয় লেখেন, 'হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠনের কোনও সদস্য কংগ্রেসের কোনও নির্বাচনী কমিটির সদস্য হতে পারবেন না'। এই হিন্দু মহাসভার দুই বিশাল নেতা ছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। নেতাজির এই চেতাবনির পর একটা দিক পরিষ্কার হয়ে যায় সাভারকর-শ্যামাপ্রসাদ-সুভাষ চন্দ্র বসুকে কখনও একাসনে বসানো যায় না। যে হাতে নরেন্দ্র মোদী শ্যামাপ্রসাদ ও সাভারকরকে পুজো করেন সেই হাতে নেতাজির পুজো করা যায় না।

অজানা সুভাষ

- ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ওড়িশার কটকে জন্ম সুভাষ চন্দ্র বসুর। তাঁর বাবা ছিলেন আইনজীবী জানকীনাথ বসু। মা ছিলেন প্রভাবতী দেবী। সুভাষ চন্দ্র ছিলেন বাবা মায়ের ১৪জন সন্তানের মধ্যে নবম সন্তান।
- নেতাজি ছোটোবেলায় কটকের একটি ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনা করেন, এই স্কুলের এখন নাম স্টুয়ার্ট স্কুল। এরপর তাঁকে ভরতি করা হয় কটকের রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে।
- ১৯১৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শন বিষয়ে বিএ পাশ করেন।
- নেতাজি ইংল্যান্ডে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে নিয়োগপত্র পান, কিন্তু চাকরি প্রত্যাখান করেন।
- অমৃতসর হত্যাকাণ্ড ও ১৯১৯ সালের দমনমূলক রাওলাট আইন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ভারতে ফিরে নেতাজি 'স্বরাজ' নামে একটা সংবাদপত্র চালু করে তাতে লেখালেখি শুরু করেন। বঙ্গীয় প্রদেশ কমিটির প্রচারের দায়িত্বেও নিযুক্ত হন।
- তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন বাংলায় উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু যখন কলকাতা পুরনিগমের মেয়র হন, তখন সুভাষ চন্দ্র বসু তাঁর অধীনে কর্মরত ছিলেন।
- স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণে ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল, প্রায় ২০ বছরের মধ্যে তিনি মোট ১১বার গ্রেফতার হয়েছিলেন। তাঁকে ভারত ও রেঙ্গুনের নানা জায়গায় রাখা হয়েছিল।

নেতাজির জন্য গান বেঁধেছিলেন উত্তমকুমার

সমুদ্র সেন

অভিনয় ও গানের পাশাপাশি উত্তমকুমারের জীবনে আরও একটি দিক হয়তো কোনওদিন সেভাবে প্রকাশ পায়নি। মহানায়ক ছিলেন একজন আদ্যন্ত দেশপ্রেমিক।

১৯৪৫ সালের ২৩ জানুয়ারি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়েছে প্রভাতফেরি। নেতাজিকে নিয়ে না শোনা একটা গান গেয়ে এগিয়ে চলেছেন একদল যুবক। গানের কথাগুলো ছিল- 'সুভাষের জন্মদিনেই গাইব নতুন গান/ সেই সুরেতে জাগবে মানুষ, জাগবে নতুন প্রাণ'।

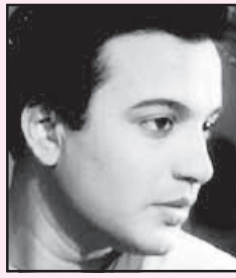

প্রভাতফেরির একেবারে সামনের সারিতে থাকা এক যুবক সুরেলা কণ্ঠে বাকিদের সঙ্গে গেয়ে এগিয়ে চলেছেন। তিনি গানটি লিখেছিলেন এবং সুর করেছিলেন। ওই যুবকের নাম অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়। ভবানীপুর অঞ্চলে সকলেই তাঁকে চেনেন। পরবর্তীকালে গোটা দেশ যাঁকে চিনেছে উত্তমকুমার নামে।

ছোটোবেলা থেকেই অভিনয় ভালোবাসতেন উত্তম। পারিবারিক নাট্যগোষ্ঠীতে নিয়মিত অভিনয় করতেন। গান ছিল তাঁর খুব প্রিয়। ছোটোবেলায় রীতিমতো তালিমও নেন। তারপর ধীরে ধীরে বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অবিসংবাদী নায়ক এবং পরে মহানায়ক হয়ে ওঠেন। অভিনয়ের পাশাপাশি তাঁর প্যাশন ছিল দেশ। তিনি ছিলেন নেতাজির পরম ভক্ত। মহানায়ক এক স্মৃতিচারণে লিখেছিলেন, 'আমাদের একমাত্র সহায় তখন নেতাজি। আমরা তখন নতুন আশার বাণীতে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখছি'। ছোটো থেকেই যখন তিনি থিয়েটার করতেন, তখন থেকে তাঁর স্বপ্ন ছিল স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে পরিচয় দেওয়া। দেশাত্মবোধক গান লিখতেন। পাশাপাশি গোপনে যোগাযোগ রাখতেন বিপ্লবীদের সঙ্গে। বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাইতো' নাটকের মহড়া চলাকালীন লিখে ফেলেছিলেন দেশের জন্য একের পর এক গান। উত্তমকুমার বিপ্লবীদের মতো বন্দুক-পিস্তল দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়েননি ঠিকই কিন্তু অভিনয় করতে করতে বার বার তাঁর মাথায় এসেছে একটাই প্রশ্ন-দেশের জন্য আমি কি করতে পারি? এদিকে বাড়ির আর্থিক অবস্থাও খুব ভালো ছিল না। পরিবারের বড়ো ছেলে উত্তমের ওপর সংসারের ভার এসে পড়ে। বাধ্য হয়ে এক সময় পোর্ট ট্রাস্টের চাকরিও করতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু দেশের জন্য কিছু করার মানসিকতায় কোনওদিন খামতি ছিল না।

নেতাজির প্রিয় তেলেভাজার দোকান

তেলেভাজার সঙ্গে বাঙালির চিরন্তন সম্পর্ক। তেলেভাজা আর মুড়ি ছাড়া বাঙালির আড্ডা জমে না। উত্তর কলকাতার এক তেলেভাজার দোকানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক ঐতিহাসিক স্মৃতি। এই দোকানের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ অ্যান্ড সন্স।

সময়টা ১৯১৮। বিহারের গয়া থেকে কলকাতায় পা রাখেন খেঁদু সাউ। উত্তর কলকাতায় করলেন একচিলতে তেলেভাজার দোকান। পেঁয়াজি, বেগুনি, কাশ্মীরি চপ তৈরি শুরু হল। এমনই তার স্বাদ যে লোকমুখে এর সুনাম ছড়িয়ে পড়তে খুব একটা সময় লাগল না। রান্নার কারিগরি ও চপ, বেগুনি, পেঁয়াজির স্বাদ চেখে বাঙালির বুঝতে অসুবিধা হল না, খেঁদু সাউ একজন দক্ষ কারিগর। রাঁধুনির বন্ধনে আটকা পড়ল কলকাতার মানুষ। ওই সময় চপ, তেলেভাজা পরিবেশন করা হতো শালপাতায়। খেঁদু সাউয়ের জনপ্রিয়তা এমন জায়গায় পৌঁছোল যে দারোগা থেকে শুরু করে কেরানির ভিড় বাড়তে লাগল। শালপাতায় মোড়া চপ খেতে ধুম পড়ে গেল। পাশাপাশি এই শালপাতা ব্যবহার হতে লাগল আরও একটি উদ্দেশ্যে। পরাধীনতার বন্ধন ছিঁড়ে স্বাধীনতার আশায় অনেক তথ্য চালাচালি হতো সেই শালপাতায়। এরমধ্যে খেঁদু নিজেও জড়িয়ে পড়লেন স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে। ধীরে ধীরে ভিড়ের মাঝে ভেসে আসা তথ্য বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ভার নিলেন খেঁদুবাবু নিজেই। ক্রমশ তাঁর দোকান হয়ে উঠল বিপ্লবীদের তথ্য চালানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। দোকানের খ্যাতি যখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল তখন খেঁদু সাউ ছেলের নামে দোকানের নাম রাখলেন লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ অ্যান্ড সন্স।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া এই লক্ষ্মীনারায়ণ অ্যান্ড সন্স-এর তেলেভাজায় নাকি মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুও। ততদিনে স্বদেশি আন্দোলনের আখড়ায় পরিণত হয় এই দোকান। এর জন্য খেঁদু সাউকে দু'বার জেলেও যেতে হয়। কিন্তু দেশ স্বাধীনের উৎসাহে ভাটা পড়েনি কোথায়। দোকানের আশপাশে তখন স্বদেশিদের মিটিং বসত। আর সেইসব সভায় মুড়ি, তেলেভাজার বরাত পেতেন খেঁদু সাউ। তেমনি এক মিটিংয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নেতাজির। খেঁদুর হাতের বানানো চপ খেয়ে তিনি খুব খুশি হন। এদিকে প্রশংসা পেয়ে খেঁদু তখন নেতাজি জ্বরে মগ্ন। তারপর ১৯৪২ সাল থেকে প্রতি বছর নেতাজির জন্মদিনে বিনে পয়সায় চপ বিলি করতে শুরু করলেন খেঁদু সাউ। সেই ধারা এখনও চলছে। নেতাজির জন্মদিনে ছোটোদের জন্য দু'টো ও বড়োদের জন্য চারটি করে তেলেভাজা বিলি করা হয়। সকাল ৭টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত চলে তেলেভাজা বিলি। দোকানের সাইনবোর্ডেও জ্বলজ্বল করছে নেতাজির ছবি। এই দোকানে পদধূলি পড়েছে কত রথী-মহারথীর। জহর রায় থেকে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় সবাই মজেছিলেন এই দোকানের তেলেভাজার স্বাদে। এই দোকানের চপ খেতে ভালোবাসতেন প্রবাদপ্রতীম সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত। এখন দোকানের হাল ধরেছেন তৃতীয় প্রজন্মের কেষ্টকুমার গুপ্ত (সাউ)। হাতিবাগান থেকে হেদুয়ার দিকে এগিয়ে গেলে ডান হাতে পড়বে এই দোকান। রয়েছে রকমারি চপ। চিরাচরিত আলুর চপ, বেগুনি, কাশ্মীরি চপ থাকলেও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তালিকায় যোগ হয়েছে আমের চপ, পনীরের চপ, চাউমিনের চপের মতো অভিনব পদ।

স্যালুট প্রিয়দা, তুমি আসল হিরো

মানস কুমার ঠাকুর

আমি তখন কলেজের ছাত্র। পার্টি, বক্তৃতা কিছুই মনে দাগ কাটত না কারণ পড়া (চাপে পড়ে) আর ফুটবল খেলা ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগত না। একবার কয়েকজন নেতা খুব সুন্দর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একজন ফুটবল খেলা নিয়েও কিছু কথা বলছিলেন। তাতেই মনটা ঘুরে যায় বক্তৃতা শোনার জন্য। সবাই ডাকছিল ও জয়ধ্বনি দিচ্ছিল 'প্রিয়দা জিন্দাবাদ'। সেই প্রথম প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে দেখা ও চেনা। পরে খেলার মাঠে বহুবার দেখেছি। ওঁর হাত থেকে পুরস্কারও নিয়েছি। কিন্তু সেরকম আলাপ তখন হয়নি। সময়ের কালস্রোতে উনিও রাজনৈতিক আঙিনায় অনেক উঁচুতে পৌঁছে যান। আর আমি 'দ্য ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট'-এর পূর্ব ভারতের কাউন্সিল মেম্বার হয়েছি। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে একবার ওনার সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতে যাই। সেই খেলার প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে আসেন। উনি তখন ভারত সরকারের জলসম্পদ মন্ত্রী। আমি অনুরোধ করেছিলাম, আমাদের কোনও একটা অনুষ্ঠানে আসার জন্য। রাজিও ছিলেন কিন্তু আমার তখন অতটা প্রভাব ছিল না। সেই মিটিংয়ে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি বলেন, 'ভাবো, কিছু ভাবো যেটা তোমাকে ও তোমার দেশকে উজ্জ্বল করবে। এখনও অনেক জায়গা আছে। লেগে থাকো-ভারতের যাঁরা বিত্তশালী লোক তাঁরা কিন্তু কস্ট অ্যাকাউন্টিং-এর প্রসার চাইবে না। কারণ তাঁরা চায় মুনাফা। যেটা সিএ'রা বলে দেয়। লেগে থাকো। সময় লাগবে'।

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস, একবার মিটিং ঠিক করা হয় রায়গঞ্জে। ওনার শরীর খারাপ ছিল। আর আমাদের কস্ট অডিট নিয়ে আলোচনা ছিল (উনি তখন ভারত সরকারের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী)। ওই মিটিংয়ে উনি একটা কথা বলেছিলেন, 'যাঁরা সাংসদ তাঁদের একটা করে সিএ ধরা আছে ট্যাক্স ফাইল করার জন্য। কিন্তু একটারও কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট নেই কস্টিং করার জন্য। তোমাদের কিন্তু খুব সমস্যা। ভেবে দেখো কী উপায় আছে। আমি আছি। কোনও বড়ো বা ছোটো কোম্পানির মালিক চান না কস্ট অডিট করে অন্যরা প্রফিট জেনে ফেলুক। তোমরা বরং ম্যানেজমেন্ট অডিট নিয়ে ভাবো'। এখন ভাবি, কথাটা কতটা দামি ছিল।

ফুটবল পাগল লোক ছিলেন প্রিয়দা। তিনি রাজনীতির সঙ্গে ফুটবলের নানা কমিটিতে ছিলেন। যেমন-১৯৯৫ সালে ফিফার টেকনিক্যাল স্টাডি গ্রুপ মেম্বার ছিলেন, একবার ফিফার ম্যাচ কমিশনার হন। আইএফএ, ফিফা- কমিশনার পর্যন্ত হন। ফুটবলে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও উৎসাহ দিতেন। ভারতীয় ফুটবল দলকে বাইরে ও বাইরের দলকে এদেশে খেলানোর ক্ষেত্রে তাঁর বড়ো অবদান ছিল। ভারতবাসী তাঁকে রাজনীতির চেয়েও ফুটবলপ্রেমী বলে মনে রাখবেন।

ওনার সঙ্গে আমার শেষবার দেখা হয় ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে। আমাদের একটা অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনুরোধ করতে গিয়েছিলাম কলকাতায়। উনি কথা দিয়েছিলেন ২০০৮ সালের মার্চের পর সময় দেবেন। ওই মিটিংয়ে উনি আবার বলেছিলেন, 'সিএ'রা তোমাদের ক্ষতি করছে। তোমরা নিজেদের শক্তিশালী কর। ১৯৬১ সালে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট-এ তোমাদের নাম ঢুকতে দেয়নি ওরাই। সেজন্যই তোমরা পিছিয়ে পড়ছ। যে দেশে শিক্ষাটা সমস্যা সেখানে কস্ট কনসেপ্ট বিক্রি করা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ভারত সরকারের খুব দরকার কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট পেশাদারদের।

আমাদের দুর্ভাগ্য এইরকম লোককে আমাদের মঞ্চে আনতে পারিনি। আর পারবও না কোনওদিন। উনি প্রথম মন্ত্রী যিনি নামকরা একটি টিভিকে ব্যান করেছিলেন খারাপ রুচি ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে অপমান করেছে বলে। স্যালুট প্রিয়দা! তুমি আসল হিরো।

নেতাজি উদ্বোধন করেন 'চিত্রা' সিনেমা হল

চিত্রা সিনেমা হল। পরে নাম বদলে হয় মিত্রা সিনেমা। ঠিকানা : ৮৩, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট। এখন এই রাস্তার নাম বিধান সরণী। এই মিত্রা বা চিত্রা সিনেমা হলের উদ্বোধন করেন স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। বর্তমানে এই হল বন্ধ।

কেমন ছিল উদ্বোধনের দিনটা?

চিত্রা সিনেমার স্থপতি ছিলেন নিউ থিয়েটার্সের মালিক বীরেন্দ্রনাথ সরকার। তিনি বি এন সরকার নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি দাদাসাহেব ফালকে ও ১৯৭২ সালে পদ্মভূষণ পান। এই বি এন সরকার কলকাতার স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে বিলেতে গিয়ে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন। কলকাতায় ফিরে চাকরি না করে, উদ্যোগপতি হয়ে নজির গড়েন। তবে সব কিছুর মধ্যে চলচ্চিত্রের প্রতি তাঁর প্রেম ছিল। তিনি যখন ভারতে ফিরলেন তখন তাঁকে একটা সিনেমা হল তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি এই প্রস্তাবে রাজিও হয়ে যান। এরপর বি এন সরকার প্রযোজনা সংস্থা ও প্রেক্ষাগৃহ তৈরিতে উৎসাহী হন। বৃহত্তম চলচ্চিত্র প্রযোজক সংস্থা নিউ থিয়েটার্স বাংলার ও বাঙালির জাতীয় সম্পদ। চলচ্চিত্র প্রযোজনার পাশাপাশি বীরেন্দ্রনাথ সরকার প্রেক্ষাগৃহ তৈরিতে উদ্যোগী হন। 'চিত্রা' সিনেমা হল ছিল তাঁর প্রথম তৈরি প্রেক্ষাগৃহ। বি এন সরকারের সঙ্গে ওই সময়ের স্টার অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা জুটি ছিল। তাঁরা দু'জনে মিলে নিউ থিয়েটার্স ও চিত্রা সিনেমা হলকে আরও উন্নত করেন। বাংলা ও বাঙালিকে নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে বাঙালির ফিল্ম কোম্পানি নিউ থিয়েটার্স বড়সড় প্রভাব বিস্তার করে সারা দেশ জুড়ে।

শুধু সিনেমা প্রেম নয়, বি এন সরকার স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গেও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর অনুগামী। বি এন সরকার তাঁর প্রেক্ষাগৃহ উদ্বোধন করার জন্য নেতাজিকে অনুরোধ করেন। নেতাজি জানান, হলের সামনে কোনও ব্রিটিশ পুলিশ মোতায়েন করা যাবে না, তবেই তিনি রাজি। বি এন সরকার এই শর্তে এক কথায় রাজি হয়ে যান। কিন্তু সমস্যা হল, সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো জীবন্ত কিংবদন্তিকে দেখতে লোকে ভিড় করবেই। এই ভিড় কীভাবে সামলানো যাবে। এসব ভেবে বি এন সরকার শেষমেষ কলকাতা ময়দানের খেলার মাঠের পালোয়ান জব্বর আলিকে এই ভিড় সামলানোর ভার দেন।

১৯৩০ সালের ২০ ডিসেম্বর হাতিবাগানে চিত্রা সিনেমা হলের উদ্বোধন করলেন কলকাতার তদানীন্তন মেয়র, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। মুম্বইয়ের অনুকরণ না করে বাঙালি রুচি ও সংস্কৃতি বিকাশের ইচ্ছা নিয়েই চিত্রা ও নিউ থিয়েটার্স তৈরি হয়, যার প্রেরণদাতাও ছিলেন নেতাজি।

কিন্তু ওই সময়ে নেতাজি বিরোধী কিছু লোকের অভাব ছিল না, যাঁদের গাত্রদাহ হতে শুরু করে নেতাজি প্রেক্ষাগৃহ উদ্বোধন করতে আসায়। তাঁরা অনুষ্ঠান বানচাল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বি এন সরকার বিরোধীদের সব চেষ্টা বানচাল করে দেন। বরং চিত্রার সঙ্গে নেতাজির নাম জড়িয়ে যায়। উদ্বোধনের দিন চিত্রা সিনেমায় প্রথম প্রদর্শিত সিনেমা ছিল রাধা ফিল্মসের 'শ্রীকান্ত'।

সেদিন উদ্বোধনে এসে সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন, বাংলা ভাষার ছবিতে বাংলা ভাষাকেই গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলায় সিনেমার টিকিট প্রকাশ করার কথাও বলেন তিনি।

বাংলার দুই বসু : আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার নেপথ্যে

অঞ্জন দে

অবশেষে এলেন - সামরিক পোশাক, বুকে নাৎসি স্বস্তিক চিহ্ন আর সেই বিখ্যাত মাছিগোঁফ। সামনেই দাঁড়িয়ে ফ্যুয়েরার অ্যাডলফ হিটলার। কিন্তু তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। সটান জবাব, ইনি হিটলার নন; একজন বহুরূপী। একই ঘটনা এরকম বেশ কয়েকবার ঘটল। তিনি উঠলেন না। হঠাৎই একটা হাত তাঁর কাঁধে নেমে এল। এবার উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বাড়িয়ে দিলেন হাত। হ্যাঁ, এইবার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন আসল অ্যাডলফ হিটলার। সুভাষ চন্দ্র বসু এবং হিটলারের প্রথম সাক্ষাৎ। হিটলারের যে এরকম বেশ অনেক বহুরূপী রয়েছে, সেটা তো প্রায় সবাই জানে। কিন্তু এই ভারতীয় কী করে আসল হিটলারকে চিনে নিলেন? আগে কি কখনও দেখেছেন? জবাবে একটু হেসে উঠলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। তাঁর পিঠে হাত রাখার মতো সাহস একমাত্র আসল হিটলারেরই আছে, আর কারোর নেই!

১৯৪১ সাল। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে আতঙ্কের আবহাওয়া, তার মধ্যেই চলছে ভারতীয়দের স্বাধীনতার লড়াই। এমন পরিস্থিতিতে গৃহবন্দি সুভাষ ঠিক করলেন, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। যদি কিছু করতে হয়, তাহলে দেশের বাইরে যেতে হবে। সেখানের ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করে শুরু করতে হবে স্বাধীনতার যুদ্ধ। শুরু হল ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায় - রাতের অন্ধকারে ব্রিটিশদের সামনে দিয়ে পালিয়ে আসা, তারপর বোবা-কালা সেজে আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া; সেখান থেকে জার্মানি। সুভাষের মাথায় তখন একটাই চিন্তা স্বাধীনতা। দেশের স্বাধীনতা। 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু'-সুভাষ এই প্রবাদকে বাস্তবে নিয়ে এলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে ইংল্যান্ড-ফ্রান্স যথেষ্ট বিপদে পড়েছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতেও স্বাধীনতার দাবি জোরালো হচ্ছিল। এটাই সুযোগ ছিল ব্রিটিশকে কোণঠাসা করার। আর সেখানেই সুভাষের মনে হয়েছিল, শুধু ঘর থেকে নয়, ঘরের বাইরে থেকেও আক্রমণ শানানো উচিত। আর তার জন্য যদি জার্মানির সামান্য সাহায্যও পাওয়া যায়! সুভাষের দাবি ছিল, ভারত সম্পর্কে জার্মানি ও হিটলারের অবস্থান স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হোক। কিন্তু হিটলার সেই পথে হাঁটলেন না। জার্মানি তখন রাশিয়ার সমরাঙ্গনে; বিশ্বযুদ্ধের চূড়ান্ত নাটকীয় মুহূর্ত চলছে। এদিকে ভারত তো অনেকটা দূর। সেইদিকে মনোযোগ দেওয়া মানে জার্মানির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়া। হিটলার নানাভাবে যুক্তির জাল বুনতে লাগলেন। একটা সময় বলেই ফেললেন সুভাষ চন্দ্র বসু, 'সারা জন্ম রাজনীতি করে কেটেছে, আমাকে উপদেশ দিতে হবে না'।

হিটলার সেভাবে সাহায্য না করলেও সুভাষের বাকি পরিকল্পনার ব্যাপারে অবাধ ছাড় দিয়েছিলেন। জার্মানি থেকেই প্রথমবার ভারতে সম্প্রচারিত করা হয় আজাদ হিন্দ রেডিও। সেখানে সুভাষের বক্তৃতা যেমন ছিল, তেমনই ছিল বিভিন্ন খবরের আদানপ্রদান। প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গবদ্ধ করার কাজটিও শুরু করেছিলেন তিনি। এছাড়াও জার্মানিতে গিয়ে দেখলেন, প্রায় সাড়ে চার হাজারের মতো ভারতীয় সৈনিক বন্দি রয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এরা ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়ে লড়াই করছিলেন। তারপর নাৎসিদের হাতে বন্দি হয়ে এখানে এসেছেন। সুভাষের কথায় এদের সবাইকেই ছেড়ে দেওয়া হল। এদেরই অনেককে নিয়ে তৈরি করলেন তাঁর প্রথম সেনাবাহিনী।

বিশ্বযুদ্ধ যত এগোতে থাকে, ততই হিটলার এবং

নাৎসি জার্মানি পরাস্ত হতে থাকে। আর বেশিদিন যে জার্মানির সাহায্য পাওয়া যাবে না, সেটা বুঝতে পেরেছিলেন নেতাজি। তাই এখান থেকে বেরিয়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু কোথায়?

একটু পেছনের দিকে ফিরে তাকাই। ১৯১৫ সালের ১২ মে। কলকাতার খিদিরপুর বন্দর থেকে জাপানি জাহাজ 'সানুকি-মারু'তে চড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আত্মীয় 'প্রিয়নাথ ঠাকুর' ছদ্মনামের পাশপোর্ট সহযোগে, টেগার্টের সামনে দিয়ে বই পড়তে পড়তে জাপান যাত্রা করেছিলেন আরেক বসু, রাসবিহারী বসু! এই যাত্রা স্বাধীনতার। এই যাত্রা ভারতের মুক্তির...

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে রাসবিহারী বসুর অবদানের কথা বলতে গেলে এটাই শুধু বলতে হয় যে মূলত, তাঁর প্রচেষ্টার জোরেই জার্মানি প্রবাসী সুভাষ চন্দ্র বসু জাপানে আহুত হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সাল থেকেই রাসবিহারী চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিলেন। বিভিন্ন জাপানি পত্রিকা ও সাময়িকীতে সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তাঁর চৌকস তারুণ্য, যোগ্যতা, অনস্বীকার্যতা এবং বুদ্ধিমত্তার গুরুত্ব তুলে ধরে একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন মূলত, এশিয়াবাদী ভারত দরদী জাপানি রাজনীতিক, প্রভাবশালী সরকারি কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সহানুভূতি লাভের জন্য। যাতে করে জাপানিদের সামনে বর্তমান ও আগামী ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে সুভাষ চন্দ্র বসুর একটি সর্বজনগ্রাহ্য ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। যেহেতু জাপান ছাড়া আর কোনও দেশ ছিল না তখন যে ভারতের স্বাধীনতা এনে দিতে পারে।

১৯৩৭ সালে রাসবিহারী বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সশস্ত্র বিপ্লব বা অস্ত্র ব্যবহার ছাড়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাবে না। তাই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন।

১৯৩৯ সালে রাসবিহারী বসু সাংহাইয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে যান। তখন রাসবিহারী হেরাম্বলালকে বলেন, 'দেশের স্বাধীনতা যে করেই হোক ভারতীয়দের শক্তিবলে অর্জন করতে হবে। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ জাপানিদের দখলে চলে গেলে এই আন্দোলন সম্পূর্ণই পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে একটি শুভ সংবাদ আছে, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুভাষ চন্দ্র বসু এখন জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। জাপান প্রবাসী ভারতীয় সহকর্মীরা তাঁকে জাপানে আহ্বান করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। এই বিষয়ে আমি সমর্থন দিয়েছি, তুমি কি বলো'? এই প্রশ্নের জবাবে হেরাম্বলাল তাৎক্ষণিক উত্তর দিলেন, 'আমি অবশ্যই রাজি'। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিস্থিতি বুঝে ১৯৪০ সালে মহাত্মা গান্ধীকে 'গতকালের লোক' বলে অভিহিত করে 'আজকের অবিসংবাদিত নেতা' হিসেবে সুভাষ চন্দ্র বসুর নাম তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে টোকিও তেৎসুদো হোটেলে রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে টোকিও, ইয়াকোহামা, ওসাকা, কোবে, নাগাসাকি প্রভৃতি জায়গায় বসবাসরত ৭০ জনেরও বেশি ভারতীয় জড়ো হয়ে 'ভারতীয় স্বাধীনতা লিগে'র মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং লিগের পতাকা উত্তোলন করেন। সভার শিরোনাম ছিল : 'আমেরিকা-ব্রিটেন ধ্বংস কর'। ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর অনুমতিক্রমে জাপানি সেনাবাহিনীর ছোট্ট একটি ইউনিট হিসেবে হেরাম্বলালকে তার প্রধান করে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করা হয়, যার সদস্য সংখ্যা ছিল ৩,০০০।

১৯৪২, ২০-২৩ জুন — লিগের দ্বিতীয় সর্বভারতীয় প্রবাসী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ব্যাঙ্ককে। এখানে জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচিন, হংকং,

বর্মা, মালয়, শ্যামদেশ থেকে ১০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করলেন। উপস্থিত হলেন জাপান অধিকৃত ভারতীয় যুদ্ধবন্দি শিবিরের প্রতিনিধিরাও। ঠিক হল লিগের সশস্ত্র শাখা 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' -এর আধিপত্য থাকবে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট 'কাউন্সিল অফ অ্যাকশন' বা সমর পরিষদের ওপর। পরিষদের অন্তর্বর্তীকালীন প্রথম সভাপতি হলেন রাসবিহারী বসু। ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে গৃহীত হল। ঠিক হল, সুভাষ চন্দ্র বসুকে বার্লিন থেকে এশিয়ায় আসার অনুরোধ করা হবে।

ব্যাঙ্কক সম্মেলন শেষে রাসবিহারী বসু জাপানের প্রধান সেনা দফতরের মেজর জেনারেল আরিয়োশিকে বলেন, 'সম্প্রতি আমার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, বয়সও হয়েছে। নেতৃত্ব দেওয়ার মতো শারীরিক অবস্থাও আমার নেই। জার্মানি প্রবাসী সুভাষ চন্দ্র বসুকে জাপানে আমন্ত্রণের অনুরোধ করতে চাই'। উত্তরে আরিয়োশি অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে বলেন, 'সরাসরি জিজ্ঞেস করছি, যদি সুভাষ চন্দ্র বসুকে জাপানে আমন্ত্রণ জানানো হয় আর তাঁকে ভারতীয় স্বাধীনতা লিগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে প্রবাসীরা সম্মতি দেন তাহলে আপনার বর্তমান অবস্থান কী হবে'? রাসবিহারী বসু দ্রুত এবং খুব সহজে উত্তর দেন, 'সুভাষ চন্দ্র বসু যদি প্রেসিডেন্ট হতে সম্মত হন, তাহলে তাঁর নীচে আমি সানন্দে কাজ করব'। রাসবিহারী বসুর এই সরল স্বীকারোক্তিতে শুধু আরিয়োশি নন, আশ্চর্য হয়েছিলেন মেজর ফুজিওয়ারা, এফ-কিকান ইউনিট প্রধান ইওয়াকুরো হিদেও প্রমুখ।

এরপরেই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যে যে স্থানে ভারতীয়রা রয়েছেন, সেখানে লিগের বহু শাখা খোলা হল। অনেক সিভিলিয়ান লিগের সভ্য হলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের জন্য মোহন সিং-এর নেতৃত্বে ভারতীয় বন্দি শিবির থেকে অনেক ভারতীয় সেনাদলে যোগদান করলেন। তাঁদের সামরিক শিক্ষা শুরু হল। পেনাঙ-এ খোলা হল 'স্বরাজ ইনস্টিটিউট' নামে একটি শিক্ষা শিবির, লিগের সদস্য যুবকরা সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে গেলেন।

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ সাল। জার্মানির কিয়েলা বন্দর থেকে সাবমেরিন যাত্রা শুরু করলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। উদ্দেশ্য জাপান। সঙ্গী হলেন আবিদ হোসেন। পথে মাদাগাস্কারের কাছে জার্মান থেকে জাপানি সাবমেরিন বদল করতে হল। সুমাত্রার সাবান বন্দরে পৌঁছালেন ৬ মে। ১৯৪৩ সালের মে মাসের ১৬ তারিখ সকালে জাপানের মাটিতে পা রাখেন।

৪ জুলাই ১৯৪৩ সাল। সিঙ্গাপুরের ঐতিহাসিক ক্যাথে অডিটোরিয়াম। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি এসে মিলিত হলেন। এই সভায় মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু একজন চমৎকার নতুন অতিথি হিসেবে সুভাষ চন্দ্র বসুকে পরিচয় করিয়ে দেন। আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্ব নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ওপর ন্যস্ত করেন। নেতাজি রাসবিহারী বসুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দু'ঘণ্টাব্যাপী এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। ৫ জুলাই

সোনানের টাউন হলের সামনে আজাদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হল, সশস্ত্র বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন নেতাজি।

২৫ আগস্ট ১৯৪৩ সাল। নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের (সুপ্রিম কমান্ডার) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে নতুন সদস্যদের যোগদান ও তাঁদের সামরিক প্রশিক্ষণ দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। অক্টোবরের মধ্যেই তৈরি হল প্রায় ৫০ হাজারের এক নিবেদিতপ্রাণ সেনাবাহিনী। এই বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া, পরিচালনা করা তথা মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন অসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেতাজি একটি অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন।

২১ অক্টোবর ১৯৪৩ সাল। সিঙ্গাপুরের ক্যাথে হলেই রচিত হল সেই অনন্য ইতিহাস। ভারতের প্রথম স্বাধীন অস্থায়ী সরকার আজাদ হিন্দ সরকারের ('আরজি হুকুমৎ-ই- আজাদ হিন্দ') ঘোষণা করা হয়েছিল। রাসবিহারী বসুকে সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা করে নেতাজি এই সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দিন কয়েকের মধ্যেই এই সরকারকে স্বীকৃতি জানাল জাপান, জার্মানি, ইতালি, বার্মা, নানকিং চিন, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, মাঞ্চুরিয়া, ক্রোয়েশিয়া সহ নয়টি রাষ্ট্র। আজাদ হিন্দ সরকারের ছিল নিজস্ব ব্যাঙ্কও। এর নাম ছিল আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৩-এ। এই ব্যাঙ্কের ১০ টাকার কয়েন থেকে শুরু করে এক লক্ষ টাকার নোটও ছিল। এক লক্ষ টাকার নোটে ছিল সুভাষ চন্দ্র বসুর ছবি। এই সরকারের ছিল নিজস্ব ডাক টিকিট ও তেরঙ্গা পতাকা।

২৩ অক্টোবর ১৯৪৩ সাল। সারা রাত ধরে চলা আজাদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেতাজি ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

৫ নভেম্বর ১৯৪৩ সাল। জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিদেকি তোজোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে নেতাজি উপস্থিত থাকেন।এই সম্মেলনে সব সদস্য দেশ ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করেন।

৬ নভেম্বর ১৯৪৩ সাল। তোজো আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দুটি আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেন। ৩১ ডিসেম্বর নেতাজি এই দুটি দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখেন 'শহিদ ও স্বরাজ' দ্বীপ।

৪ জানুয়ারি ১৯৪৪ সাল। নেতাজি রেঙ্গুনে প্রধান সামরিক দফতর স্থাপন করেন। আজাদ হিন্দ সরকারের মূল ধ্বনি ছিল 'জয়হিন্দ, দিল্লি চলো'। ১৯৪৪ সালের মে মাসে আজাদ হিন্দবাহিনী কোহিমা দখল করে। ভারতীয় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয় ভারতের মাটিতে। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের পর ইংরেজদের যুদ্ধে হারিয়ে ভারত স্বাধীন করার সম্ভাবনা অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে গেল। তারপর আগস্ট মাসে হিরোশিমা, নাগাসাকির পর যখন নেতাজির বিমান (?) তাইহোকুতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল, তখন থেকেই বাস্তবের নেতাজির থেকে কল্পনার নেতাজির ছায়াটা দীর্ঘতর হতে লাগল।

সাহেবি পোশাক পছন্দ ছিল না সুভাষের

নুরানী ইসলাম

'লার্নিং বিগেইনস অ্যাট হোম'-কথাটি খুবই প্রাসঙ্গিক। সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনের দেশপ্রেম, সাহসিকতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার যে পরিচয় আমরা পাই তার সূচনা সেই শিশুকাল থেকেই। সুভাষ চন্দ্রের মা প্রভবতী দেবী ছিলেন আত্মসচেতন, তেজস্বিনী ও মমতাময়ী মহিলা। পিতা জানকীনাথ বসু সাহেবি পোশাক পছন্দ করতেন। তাই তিনি ছেলেদেরও সাহেবি পোশাকে অভ্যস্ত করে ছিলেন। এটাও ঠিক জানকীনাথ বসুও স্বদেশের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। অনেকক্ষেত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুভাষ চন্দ্র বসু কটকের যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন সেখানে সব সাহেবদের ছেলেরা পড়াশনা করতেন। তবে সুভাষ চন্দ্রের সাহেবি পোশাক পছন্দ ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন ওই পরিবেশে। তাই তাঁকে সেই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে রেভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করা হয়। সেখানকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন বেণীমাধব দাস। এই শিক্ষকের আদর্শ সুভাষকে বেশ প্রভাবিত করে। পরে তিনি নিজের আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেছিলেন, 'বেণীমাধব দাসকে দেখার পর শ্রদ্ধা কাকে বলে তা মনে প্রাণে অনুভব করেছি'। তবে বেশিদিন সুভাষ চন্দ্র তাঁকে পাননি। বেণীমাধব দাসের বদলি হয়ে যায়। চিঠির মাধ্যমে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন, কীভাবে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হয়। মানুষের কল্যাণে কীভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়। তাঁর কাছ থেকে সুভাষ চন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। একদিন জানকীনাথ বসু লক্ষ্য করেন সুভাষ সাহেবি পোশাক ছেড়ে ধুতি, পাঞ্জাবি ও পিরান পরে স্কুলে যাচ্ছেন। বাবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন সে এই পোশাক পরে স্কুলে যাচ্ছে। সুভাষ চন্দ্র উত্তর দিলেন, 'এটাই তো আমাদের ভারতীয় পোশাক। আমাদের প্রধান শিক্ষকও এই পোশাক পরিধান করেন, আর আমি যদি সাহেবি পোশাক পরে স্কুলে যাই, তবে কি ভালো দেখায়'! বাবা ছেলের এই নির্ভীক উত্তর শুনে অবাক, তবে মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'তুমি যদি এই পোশাকে স্বাচ্ছন্দবোধ কর তবে তাই হোক'। সুভাষ চন্দ্র খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি সেবামূলক কাজে নিজেকে সবসময় নিয়োজিত রাখতেন। গ্রীষ্মকালে প্রায় প্রতিদিন দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। মা জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিলেন, একটি বিশেষ কাজে যেতে হচ্ছে আর কিছুদিন যেতে হবে। ছেলের এই

আচরণে মা সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং বাবাকে জানান। জানকীনাথ বসু খবর নিয়ে জানতে পারেন সুভাষের সহপাঠীর বসন্ত হয়েছে। এই খবর জানতে পেরে বাবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি জানো না, এই রোগটি অত্যন্ত সংক্রামক'? উত্তরে সুভাষ বলেন, 'জানি রোগটি সংক্রামক। সংক্রামকের ভয়ে রোগীকে সেবা না দিলে রোগী বাঁচবে কীভাবে'? তখন জানকীনাথ বসু পুরসভার মেয়র ছিলেন। তিনি ওই রোগীর চিকিৎসারভার গ্রহণ করেন। এমন করে ছোট্ট সুভাষ তার দলবল নিয়ে মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকত। একবার কটকে একটি মুসলিম বস্তিতে আগুন লেগে যায়। মানুষ দিশেহারার মতো ছোটাছুটি করতে থাকে। তখন সুভাষ তার বাহিনী নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে লেগে পড়ে। এই খবর পেয়ে তাঁর শিক্ষক গোপাল চন্দ্র গাঙ্গুলী এসে তাদের কর্মকাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যান।

সুভাষ চন্দ্র সব শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মিশতে পারতেন। তাঁর কাছে জাতপাতের কোন বিচার ছিল না। ছেলেরা তাঁর সঙ্গে খুব সহজেই বন্ধু হয়ে যেত। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসীম। যখন তিনি অষ্টম শ্রেণিতে পড়েন তখন বসন্ত মহামারির রূপ নেয়। সেই সময়ও সুভাষের বাহিনী পাড়ায় বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ওষুধ বিলি করা ও রোগীকে সেবা শুশ্রূষা করতেন। সেই সময় থেকেই তিনি বিবেকানন্দের সেবার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। সেই সময় একদল দস্যু তাঁর কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করত। সেই দলের সরদার ছিল হায়দার মোবাল। সে ওড়িশার এক মুসলিম বস্তিতে থাকত। সে বস্তির কিছু লোককে প্ররোচিত করে সুভাষ বাহিনীর বিরুদ্ধে কাজ করতে লাগল। এই অবস্থায় হায়দার মোবালের বাড়িতেও বসন্ত থাবা বসায়। তার একমাত্র ছেলে ও বউ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। হায়দার যায় ডাক্তার ডাকতে কিন্তু ডাক্তার না পেয়ে সে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে সে হতভম্ব। সে দেখে সুভাষ ও তাঁর বাহিনী হায়দারের ছেলে ও বউকে সেবা শুশ্রূষা করছে। সে যাত্রায় তার ছেলে এবং বউ দু'জনেই বেঁচে যান। হায়দারও তার স্বভাব বদলে সুভাষের অনুগামী হয়। সুভাষ চন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েন তখন একজন ইংরেজ শিক্ষক বাঙালি জাতি সম্বন্ধে কটূক্তি করেন। তখন সুভাষ তাঁকে প্রহার করেন। এতে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। পরে তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়ে বিএ পাস করে বিলেত যান।

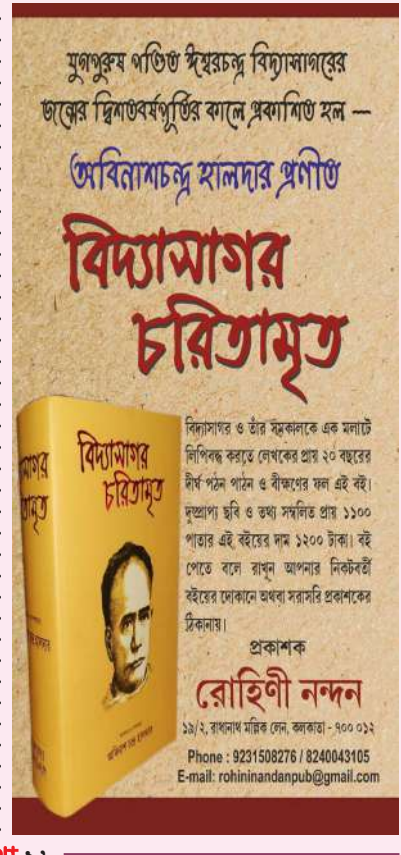

মহাজাতি সদনের সঙ্গে জড়িয়ে নেতাজির কাহিনি

কলকাতার মহাজাতি সদনের নাম শোনেননি এমন মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা। মহাত্মা গান্ধি মেট্রো স্টেশনের কাছে মহাজাতি সদন হয়তো অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘ এক ইতিহাস। এই মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠার পেছনে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯৩৯ সালের ১৯ আগস্ট সুভাষ চন্দ্র, বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ কিছু বিশিষ্টদের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তবে তার আগে ১৯৩৭ সালের মে মাসে সুভাষ চন্দ্র বসু এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁর বন্ধু অ্যাডভোকেট নৃপেন চন্দ্র মিত্র ও স্থানীয় কয়েকজন যুবককে নিয়ে এক সভা ডেকেছিলেন। ওই সভায় সুভাষ কলকাতার নাগরিকদের সভা সমিতি করার জন্য একটা বড়ো প্রেক্ষাগৃহ তৈরির ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এর কিছুদিন পর তিনি মধ্য কলকাতার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ যার বর্তমান নাম চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ও হ্যারিসন রোড বর্তমান নাম মহাত্মা গান্ধি রোড সংযোগস্থলের কাছে কলকাতার পুরসভার ৩৮ কাঠা জমির খোঁজ পান। এই স্থানটা সুভাষ প্রেক্ষাগৃহ তৈরির জন্য বাছাই করেন। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে কলকাতা পুরসভা ১ টাকা লিজে জমিটা সুভাষকে দেন। ওই প্রেক্ষাগৃহের নামকরণের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করা হয়। এরপর রবীন্দ্রনাথ প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ করেন 'মহাজাতি সদন'। শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট স্থপতি নকশা তৈরির দায়িত্ব পান। তারপর সুভাষ চন্দ্র নিজেই রবীন্দ্রনাথকে প্রেক্ষাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুরোধ করেন।

এদিকে ১৯৪১ সালে সুভাষ চন্দ্র বসু দেশত্যাগ করলে মহাজাতি সদন নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার ওই সময় তাঁকে ফেরার ঘোষণা করে ও তাঁর নামে থাকা জমির লিজও বাতিল করে। তখন সুভাষের দাদা শরৎ চন্দ্র বসু ও নৃপেন চন্দ্র মিত্র ব্রিটিশ সরকারের এইরকম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করেন। আদালতের রায়ে কিছুদিন বাদে এভাবে লিজ বাতিল করা বেআইনি বলে ঘোষিত হয়। এরপর ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মহাজাতি সদন বিল পাশ হয়। এরপর ওই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় ফের মহাজাতি সদন নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ১৯৫৮ সালের ১৯ আগস্ট তিনিই মহজাতি সদনের দ্বারোদঘাটন করেন।

মহাজাতি সদনের মূল ভবনটি চার তলায়। এই বাড়ির মাঝখানে ১৩০০ আসন বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহটি রয়েছে। এছাড়া চারপাশে রয়েছে কয়েকটি হল। যেখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। একতলা মঞ্চের ডানপাশে একটি বড়ো হলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্রান্ত একটি স্থায়ী প্রদর্শনী হয়। সদনের চারতলায় রয়েছে ১০০ আসন বিশিষ্ট সভা কক্ষ। তাছাড়াও মহাজাতি সদনের মূল প্রবেশ পথের দু'ধারে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুভাষ চন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তি।

দাদাঠাকুর ও নেতাজির সম্পর্ক

দেবজ্যোতি ঘোষ

সুভাষ চন্দ্র বসু ও দাদাঠাকুর (শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) দু'জনেই ছিলেন প্রবাদপ্রতিম মানুষ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। সুভাষ চন্দ্র ও দাদাঠাকুরের সম্পর্ক ছিল খুব গভীর ও আত্মিক। দাদাঠাকুর একটা সংবাদপত্র চালাতেন। একদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওই পত্রিকা বিক্রি করছিলেন। সেই সময় পুলিশ ওনার ওপর খুব নজর রাখত। উনি সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে ইংরেজ বিরোধিতা করতেন। সেই অজুহাতে পুলিশ তাঁকে হেনস্তা করেছিল। তাঁর অপরাধ ছিল হকারির লাইসেন্স ছিল না। ওই সময় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু গাড়ি নিয়ে তাঁর সামনে আসেন ও সব কিছু শোনার পর তাঁকে গাড়িতে উঠতে অনুরোধ করেন। কলকাতা পুরসভায় নিয়ে গিয়ে হকারির লাইসেন্স বের করে দেন। সুভাষ চন্দ্র কিন্তু এই সাধারণ হকারটিকে অসাধারণ মানুষ মনে করতেন।

দাদাঠাকুর বাগমারি অঞ্চলে থাকার সময় ওই এলাকার রাস্তাঘাট, জলনিকাশি ব্যবস্থা খুব খারাপ ছিল। যার কারণে এলাকায় সব সময়ে নোংরা থাকত। তাই একদিন দাদাঠাকুর বাড়ির মালিকের (যে বাড়িতে উনি ভাড়া থাকতেন) ফোন থেকে নেতাজির সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুরোধ করেন, জায়গাটা পরিষ্কার করে দিতে। ঠিক তার ১ ঘণ্টার মধ্যে জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এই ঘটনায় ওই বাড়ির মালিক দাদাঠাকুরকে অনুরোধ করেন বিনা ভাড়ায় থেকে যাওয়ার জন্য। কিন্তু দাদাঠাকুর তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। খুব অল্প দিনেই ওই বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যান। নেতাজি যখন জাপানে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন, তার আগে তিনি দাদাঠাকুরের বাড়িতে যান দেখা করতে। তখন তিনি দাদাঠাকুরকে বলেন কীভাবে যাত্রা করবেন। ওই সময় দাদাঠাকুর নেতাজিকে পরামর্শ দেন, তিনি যখন যে স্থানের ওপর দিয়ে যাত্রা করবেন তখন সেখানকার দৈনিক সংবাদপত্র দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে ও পড়ার ভান করতে তাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। এভাবে দু'জনের কথোপকথন হত। দাদাঠাকুরের গোলমহরের নিজের বাড়িতে নেতাজির ২৯টি চিঠি ছিল। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, সেখান থেকে একটা চিঠি নেই আর। তখনই তিনি বুঝে ছিলেন যে কেউ ওই চিঠিগুলোতে হাত দিয়েছেন। দাদাঠাকুরের কাছে ওই চিঠির থেকে তখন দেশের স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা অনেক বেশি মূল্যবান ছিল। তাই তিনি পরে বাকি সব চিঠি হাওড়া ব্রিজ থেকে গঙ্গার জলে ফেলে দেন। ওই কাজটি করতে তাঁর মন চায়নি কিন্তু তার কাছে কর্তব্য, দেশপ্রেম ও গোপনীয়তা রক্ষা অনেক বেশি মূল্যবোধ এনে দিয়েছিল।

নেতাজি ও রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট

তনুশ্রী চক্রবর্তী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস। ভারতের বুকে গান্ধিজির নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চলছে আন্দোলন 'ভারত ছাড়ো'। ঠিক ওই সময়ে ভারতের বাইরে সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বানে একদল তরুণী যোগদান করেন সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীতে। ১৯৪৩ সাল, নেতাজি সিঙ্গাপুরে পৌঁছোন। এশিয়ার প্রথম নারী বাহিনী গঠিত হয় জাপানে। নেতাজির বিখ্যাত শ্লোগান- 'তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'।

এই সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কর্মী ছিলেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার লক্ষ্মী স্বামীনাথন। পরে তিনি ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী নামে পরিচিত হন। তিনি মাদ্রাজের বাসিন্দা ছিলেন। দেশকে রক্ষা করতে সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে মহিলা রেজিমেন্ট। যার নাম ছিল রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট।

নেতাজির ডাকে নিরক্ষর দিন-মজুর পরিবারের মেয়েরাও এগিয়ে আসেন আত্মঘাতী শাখার হয়ে দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করতে। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করে শহিদ হন ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময়। ওই বীরাঙ্গনা নারীকে স্মরণ করে বাহিনীর নাম হয় ঝাঁসি রানি রেজিমেন্ট।

নারীরা সবাই প্রশিক্ষণ নেন। সিঙ্গাপুরে ৫০০ নারীর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আরও নানা জায়গায় ৩০০ মহিলা যোগদান করেন ও তাঁদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৬ মাসের সামরিক প্রশিক্ষণের সময় মেশিনগান, টাইমগান, হাত বোমা ছোঁড়া, রাইফেল চালানো শিখতে হত। এছাড়াও আধমন বোঝা নিয়ে সদস্যদের ১৫ থেকে ২০ মাইল হাঁটতে হত। এই বাহিনীর এক শ্রেণির কাজ ছিল যুদ্ধ করা আর এক শ্রেণির কাজ ছিল আহতদের সেবা করা। ধীরে ধীরে বাহিনী সক্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রানি বাহিনীর সেবিকা ছিলেন বেলা দত্ত। আজাদ হিন্দ বাহিনীর হয়ে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। পরে দক্ষতার বলে তিনি হাবিলদার পদে উন্নীত হন। এই রানিবাহিনী পরিচালনা করতেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেহেগল। এছাড়াও উল্লেখ্য, কমান্ডার জানকী দেবাশিস, লেফটেন্যান্ট আশা সহায়, অঞ্জলি ভৌমিক, ষোলো বছরের সরস্বতী রাজমানির নাম। এই বাহিনীর বিপর্যয় নেমে আসে জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে। কারণ এই বাহিনীর সব ব্যয়ভার বহন করত জাপান সরকার। ১৯৪৫ সালে মহিলা বাহিনীর কর্ণধার ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী পরাজিত হলে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

সত্যজিৎ রায় ছাড়া টলিউডের কেউই বিরজু মহারাজকে কাজে লাগাননি

মধুমিতা রায়, নৃত্যশিল্পী

সদ্য অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছেন কত্থক গুরু বিরজু মহারাজ। দেশের পাশাপাশি বিদেশেও তাঁর অগণিত ভক্ত ও ছাত্রছাত্রী ছড়িয়ে রয়েছেন। বলিউডের মাধুরী দীক্ষিত থেকে শুরু করে আলিয়া ভাট, দীপিকা পাড়ুকোন, কামাল হাসানের মতো অভিনেতাদের তিনি ছিলেন কোরিওগ্রাফার। এহেন গুরুর একনিষ্ঠ শিষ্যা মধুমিতা রায় তাঁর মহারাজজিকে নিয়ে করলেন স্মৃতিচারণা।

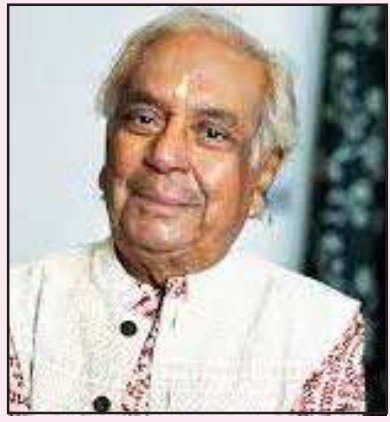

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নানাভাবে আমি বিরজু মহারাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলাম। কখনও নাচের প্রশিক্ষণ নিতে, কখনও অনুষ্ঠানে, কখনও বা নিছক নির্ভেজাল আড্ডায়। তাঁর মতো প্রবাদপ্রতিম মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পারাটা আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য। ঈশ্বরের অসীম কৃপা।

আচমকা তাঁর মৃত্যুতে আমি আমার অভিভাবক, গুরু ও বাবাকে হারালাম। মহারাজজিকে ঘিরে আমার জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব!

ওনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯৯১ সালে। সেইসময় ভারত উৎসব হয় জার্মানিতে। সারা দেশ থেকে ১৬জন উঠতি নৃত্যশিল্পী ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। আইসিসিআর, কলকাতার পক্ষ থেকে এক উঠতি নৃত্যশিল্পী হিসাবে অংশ নিয়েছিলাম। উৎসবের প্রাণপুরুষ ছিলেন বিরজু মহারাজ। নৃত্যশিল্পী হিসাবে তাঁর নাম অনুষ্ঠানের আগেই দেখেছিলাম। কিন্তু সেই প্রথম তাঁকে সরাসরি দেখি। খুব ভয় পাচ্ছিলাম, অত বড়ো ব্যক্তিত্ব তাঁর সামনে কী করে গিয়ে দাঁড়াব! অথচ মহারাজজি খুব সহজে আমাকে কাছে ডেকে আপন করে নেন। মনে হয় যেন কত দিনের চেনা মানুষ। দু'মাসের ওই ট্যুর আমার কাছে চিরস্মরণীয়। হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও মহারাজজি আমাদের নাচ নিয়ে নানা ধরনের গল্প বলতেন। তাঁর প্রতিটি গল্প ছিল শিক্ষণীয়। সেই থেকে বিরজু মহারাজের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। তাঁর পরলোকে পাড়ি দেওয়া পর্যন্ত সেই সম্পর্ক অটুট ছিল।

ভারত উৎসবের ঠিক পরের বছর ১৯৯২ সালে মহারাজজির পরামর্শে তাঁর দিল্লির কত্থক কেন্দ্রে নাচের তালিম নিতে গিয়েছিলাম। তিনি যেমন দিনেরবেলা নাচের তালিম দিতেন ঠিক তেমনি সন্ধেবেলা থাকত স্পেশাল ক্লাস। যেখানে শুধুমাত্র তাঁর ঘনিষ্ঠরা থাকতেন। সেই তালিকায় আমার থাকার সুযোগ হয়। শেখানোর ক্ষেত্রে কখনও সময় মেপে শেখাতেন না। দিনেরবেলা যেমন দেড়-দু'ঘণ্টা ধরে নাচের তালিম দিতেন, ঠিক তেমনি সন্ধে ৭টায় শেখানো শুরু করে কখনও তা রাত দশটা বা সাড়ে দশটাও বেজে যেত। তাঁর শেখানোর ধরনটাও ছিল

অন্যরকম। কাউকে বকাঝকা করতেন না। কত্থক নাচের তাল-বোল একটু কঠিন হয়। তাই সাধারণ মানুষ সহজভাবে নিতে পারেন না। এক্ষেত্রেও তিনি নানাধরনের খাবারের সঙ্গে মিলিয়ে তাল-বোল ব্যবহার করতেন, যা খুব সহজেই বাচ্চাদের আকর্ষণ করে। কাউকে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতেন না। পছন্দ অনুযায়ী শেখাতেন। মহারাজজি সবসময় একটা কথা বলতেন, নাচ মানে শুধুমাত্র অঙ্গভঙ্গি ও মুদ্রার প্রকাশ নয়। নাচের মধ্যে থাকতে হবে ভাব ও রস। তিনি বলতেন, একটা নাচ দেখে দর্শকরা হাততালি দিতে পারে। কিন্তু তার রেশ বেশিক্ষণ থাকে না। কিন্তু যে নাচ দেখে দর্শকদের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'বাঃ' শব্দটা বেরিয়ে আসে সেই নাচের রেশ থাকে চিরদিন। নৃত্যশিল্পীদের এধরনের নাচতে হবে। মহারাজজির শেখানো পথ ধরে আমি ছাত্রছাত্রীদের নাচ শেখাই।

মহারাজজির সঙ্গে দেশে-বিদেশে নানা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি। কলকাতা সহ ভারতের বড়ো বড়ো শহরে তাঁর সঙ্গে যেমন অনুষ্ঠান করেছি ঠিক তেমনি বিদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইতালি, প্রভৃতি দেশেও অনুষ্ঠান করেছি। বিদেশে গিয়ে দেখেছি বিদেশি ও প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে তাঁকে ঘিরে বিপুল জনপ্রিয়তা ও উন্মাদনা।

কত্থক নাচের শিল্পী হলেও অন্য ধরনের নাচ নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনো ছুঁৎমার্গ ছিল না। সব ধরনের নাচ দেখে তা থেকে রস আস্বাদন করতেন মহারাজজি। পছন্দ করতেন বলিউডের ফিল্মি নাচ। মহারাজজির ছোঁয়ায় বলিউডের ফিল্মি গানের নাচ এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল। সিনেমার গানের কোরিওগ্রাফিতেও তিনি ঠুমরিকে ভিত্তি করে নাচের কম্পিটিশন তৈরি করেছিলেন। মহারাজজি বলতেন, কত্থক নাচকে আমজনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম বলিউডের সিনেমা। তিনি নাচের কোরিগ্রাফার ছিলেন বলিউডের মাধুরী দীক্ষিত, আলিয়া ভাট, দীপিকা পাড়ুকোন, দক্ষিণের সুপারস্টার কমল হোসেনের। ছোটো একটা ঘটনার কথা বলি। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়াতে ওঁর সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে মায়ের সঙ্গে নাচ দেখতে এসেছিলেন মাধুরী দীক্ষিত। অনুষ্ঠানের পর মাধুরী দীক্ষিত আমাদের সঙ্গে নাচের ওয়ার্কশপে অংশ নেন। মহারাজজি যা যা বলছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। মাধুরী দীক্ষিতের মতো 'ডাউন টু আর্থ' কাউকে দেখিনি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সত্যজিৎ রায় ছাড়া টলিউডের কোনো পরিচালক তাঁকে সেভাবে কাজে লাগাননি। হয়তো কলকাতায় সেই পরিকাঠামো ছিল না।

মহারাজজির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল তাঁর আধুনিক সৃজনশীলতা। যেকোনো বিমূর্ত বিষয়েও তিনি নাচের কম্পোজিশন তুলে ধরতেন। যেমন সংবাদপত্র নিয়ে তাঁর অসাধারণ একটা নাচের কম্পোজিশন ছিল। যেখানে খবর তৈরি থেকে বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ পৌঁছে দেওয়ার দৃশ্যটা নাচের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। একবার মুম্বাইয়ের এক পরিচালক তাঁকে নিয়ে একটা তথ্যচিত্র করেন। শ্যুটিংয়ের সময় পরিচালক কাট, লঙ শর্ট, ক্লোজ শর্ট, এডিটিং প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করেন। এই তথ্যচিত্র শেষ হতেই মহারাজজি এডিটিং বিষয়ে এক কোরিগ্রাফি করেন। এছাড়াও 'লীনাদিবা' নামে এক নাচের কম্পোজিশনে তিনি নৃত্য শিল্পীদের নানা বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। যেকোনো ছোটোখাটো বিষয়কেও নাচের আঙ্গিকে তুলে এনেছিলেন।

মহারাজজি নাচ ছাড়াও নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পারতেন। যেমন, নাল, পাখোয়াজ। ভালোবাসতেন কলকাতার রসগোল্লা খেতে। নাচের তাল-বোলও ব্যবহার করেন রসগোল্লার সঙ্গে মিশিয়ে। যেমন, তাতা থৈ থৈ রসগোল্লা। পছন্দ করতেন চাট, ফুচকা। আমার বাড়িতে এসে ভাত, মাছও খেয়েছেন। তবে তিনি খুব অল্প খেতেন। পছন্দ করতেন বলিউড ও হলিউডের সিনেমা দেখতে। আদ্যন্ত শিল্পরসিক মানুষটার পছন্দের বিষয় ছিল গাড়ি ও গ্যারেজ।

ওঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে এক মাস আগে দিল্লির বাড়ি গিয়েছিলাম দেখা করতে। কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল কিন্তু ভাবতে পারিনি তিনি এভাবে চলে যাবেন। এই মাসের ২৮, ২৯, ৩০ তারিখে কলকাতায় নাচের ওয়ার্কশপে মহারাজজির আসার কথা ছিল। তার মধ্যে আই সিসিআর-এ একটা ওয়াকর্শপ ছিল যেখানে আমারও যাওয়ার কথা ছিল। ওঁর শেখানো পথ ধরে এগিয়ে যেতে যাই।

হারানো রূপকথা

তানিয়া

হারিয়ে যেতে চাই গো আমি
তেপান্তরের পাড়ে,
সাগরজলের নীল নীলিমায়
সপ্ত-পারাবারে।
চাঁদের দেশে দেখতে যাবো
চরকা কাটা বুড়ি
ঝিলমিল সব তারাগুলো
দেখতে লাগে ঘুড়ি।
এক যে ছিল রাজা-রানি
কোন সে অচিনপুরে?
রাজকন্যা ঘুমায় যেথা
সোনার পালঙ জুড়ে!!!
চলতে চলতে থমকে যাবো
নতুন কোনো দেশে...
অরুণ-বরুণ-কিরণমালা
হাজির হবে এসে।
দেখা হবে সাতটি ভাইয়ের
পারুল বোনের সাথে,
বন্ধু করে আনবো ধরে
হাতটি রেখে হাতে।
কেউ কি জানো কোথায় গেলে
তাদের পাওয়া যায়???
রূপকথারা কাঁদছে আজও
কংক্রিটেরই গায়ে।।

স্বপ্নের রং

ইন্দ্রনীল ব্যানার্জী

চাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বের মাঝে রাত
গড়িয়ে হয়ে এলো ভোর....
হঠাৎ বলে উঠলো শ্রীময়ী,
এই, একি করলে তুমি, শেষ পর্যন্ত দিলে হাত
আমার পায়ে?
তুমি না আমার থেকে বড়।
কুমার বলল, ভুল করছো তুমি...
করিনি প্রণাম তোমায়,
দেখছো না হাতের চেটো যাচ্ছে দেখা আমার।
এই টানা-পোড়নের মাঝে আবার
বাড়ির লোকের চাপা গুঞ্জন,
কি বলবে লোকে, কোথায় ছিলি রাতভর...শ্রী?
আলো আঁধারী পাখির কলরবের মাঝে
লাঞ্ছিত শ্রীময়ী যেতে যেতে ফিরে তাকায়...
কিন্তু একি?...এতো অন্য মুখ।
ভাবে কুমার; স্বপ্নের কি কোনও রং হয়?

ভারতবর্ষ জেগে আছে

পূবালী চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ জেগে আছে .....।।
ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে একদল,
জ্বলছে বুকে অহরহ দাবানল।
সাজ-সাজ রব! দিকে দিকে প্রস্তুতি মহারা।
সীমান্তের যুদ্ধ কড়া নেড়েছে;
একান্ত আটপৌড়ে গোছানো গৃহকোণে।
তবুও, তুমি তো ফিরে এলে না সেনাপতি!
তোমার না ফেরানোটাই ঘোষণা করল
তোমার তীব্র উপস্থিতি।
তবুও আমার দেশ জুড়ে বিপ্লব ঘটে কই?
হলাহল পান শেষে নীল হয়ে গেলে রক্ত,
বিপ্লব স্তব্ধ হয়ে যায়।
শাণিত অস্ত্রাঘাতে, আরো কত রক্তপাতে
আমাদের আত্মা মোহমুক্ত হবে?
সেনাপতি আমার কথা মনে আছে?
যাকে তুমি দিয়ে গেলে অনন্ত নির্বাসন!
সীমান্তে অগণিত নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন —
মনে পড়ে আমাদের আলিঙ্গনের উষ্ণতার
ওম?
একদিন খসে গেলে যোদ্ধার বর্ম;
শুরু হবে আশ্চর্য বিপ্লব।
ভারতবর্ষ উঠবে জেগে জ্ঞানের মন্ত্রে।
সেই দিন যুদ্ধ বাজ খুঁজে পাবে
প্রেয়সীর 'গভীর চুম্বন'।
'সেনাপতি' এক চিলতে হাসি মেখে
মহিরুহসম শান্ত-স্নিগ্ধ তুমি
বলবে 'এখনো ভারতবর্ষ জেগে আছে'।

১২৫তম জন্মদিনে সশ্রদ্ধ প্রণাম

ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মণ

স্বাধীন দেশে মুক্ত মনে বিহঙ্গ সম
ঘুরিতেছি হেতা হোতা,
ভুলিব কেমন যাঁদের রক্তে পেলাম
স্বপ্নের এ স্বাধীনতা।
স্বাধীনতার বীর যোদ্ধারাও ছিলেন
মাতা পিতার সন্তান,
স্বদেশ চেতনা বাহির করিয়াছিল তাঁদের
করিতে মুক্তির সন্ধান।
অুক্তি যোদ্ধাদের নেতৃত্বে ছিলেন নেতাজি
ছিলেন আগে সবার,
রণ কৌশলে ছিলেন নিপুণ
বুদ্ধিতে ছিলেন তুখোড়।
ঘব্রটিশদের চোখে দিয়াছেন ধূলা
নিজের বুদ্ধি বলে,
কত কাণ্ডই না করিয়াছেন
নির্ভীক বরেণ্য এ ছেলে।
আজাদ হিন্দ ফৌজ করিয়াছিলেন গঠন
খুদুর রেঙ্গুনে গিয়া,
তুলিয়াছিলেন স্বাধীন ভারতের পতাকা
দেশ মুক্তির শপথ নিয়া।
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব করিয়াছিলেন ত্যাগ
দেশ স্বাধীন করার তরে,
আজ তাঁর জন্মদিনে মোরা জানাই প্রণাম
শ্রদ্ধার ডালি ভরে।

ঐতিহাসিক নিলাম

১৯৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী, রেঙ্গুনের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিং প্রাঙ্গনে নেতাজীর সম্মানে আয়োজিত হয়েছিল এক বিশেষ সভা / বর্মায় এটি প্রথম জনসভা, গন্যমান্য ব্যক্তি থেকে সাধারণ মানুষের মিলনে সভা তখন জনসমুদ্র / নেতাজী নামের এমন জাদু //সভার প্রথমে বর্মার অধিবাসীদের তরফ থেকে নেতাজীকে একটি মালা পরানো হয় /তারপর নেতাজী প্রায় দু ঘণ্টা বলে গেলেন .....কখন যে এতটা সময় কেটে গেছে কেউ টের পায়নি--শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ /এবার নেতাজী মালাখানি নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বল্লেন --এই মালাখানি সমস্ত বর্মাবাসী মানুষের শুভেচ্ছার প্রতীক /এই হিসাবে এটি অমূল্য / কালে এটি শুকিয়ে হয়ে যাবে মূল্যহীন / তাই এই মুহূর্তে এর যথার্থ মূল্যয়নের জন্যে আমি এটি নিলাম করতে চাই /যে অর্থ পাওয়া যাবে তা দিয়ে রেঙ্গুনে খোলা হবে আজাদ হিন্দ সংগ্রহশালা //সর্বপ্রথম আকুল কণ্ঠে চিৎকার করল এক শিখ যুবক হরগোবিন্দ সিং -- 'নেতাজী,ঐ মালা আমি কিনতে চাই,এক লাখ ডলার মূল্য দেব'স্হানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী ব্রিজলাল হরগোবিন্দ কে পিছনে ফেলে বলেন --'আমি চাই ঐ মালা,দাম দু লাখ ডলার'আর একজন হেঁকে ওঠেন --আড়াই লাখ //ব্রিজলাল গলা চরান --তিন লাখ ডলার--- ,;তিন লাখ দশ হাজার..... মালার মূল্য ক্রমশই উর্ধমুখি ,হরগোবিন্দ নাছোরবান্দা চিৎকার করেন --চার লাখ //সভার জনতা হরগোবিন্দকে সমর্থন করে...ব্রিজলাল এসেছেন ব্যবসায়ী ওঅহংকারী মনে, তিনি এটাকে পরাজয় মনে করে বলেন--'তবে পাঁচলাখ এক হাজার....হরগোবিন্দ বুঝলেন তাঁর আশা পূর্ণ হবার নয়, প্রায় সর্বস্ব পণ করেও পারলেন না ঐ পরম সম্পদের মালিক হতে...নিলাম চলতে থাকে দুই ধনকুবেরের মধ্যে, শেষে দাম উঠলো সাত লক্ষ ডলার....দিয়েছেন ব্রিজলাল...ব্রিজলাল এগিয়ে চলেছেন সম্পদটি নিতে, নেতাজী আসছেন সমর্পন করতে...ঠিক সেই মুহূর্তে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন হরগোবিন্দ----- 'নে---তা---জী' .....জনতা বললে -নেতাজীকে ডেকে কি হবে..? ক্ষমতা থাকে তো দাম বারাও...হরগোবিন্দ বল্লে -তোমার সঙ্গে আমার কথা নেই ,যা বলার নেতাজীকে বলব...নেতাজী বললেন--বলো ,কি বলতে চাও / হরগোবিন্দর চোখেতখন জল আর আগুন--- 'ভিক্খা করার ভঙ্গীতে বললেন =====''নেতাজী,সিঙ্গাপুরে আমার ক'খানা বাড়ী আছে, গ্যারাজে আটখানা ট্রাক আছে, তিনচার লক্ষ ডলার আছে, আরও হয়ত কিছু আছে--জানিনা সব যোগ করলে সাত লক্ষ ডলার ছাড়িয়ে যাবে কিনা !!!তবে এই নিলামে আমার শেষ ডাক--যেখানে আমার যা কিছু আছে,শেষ কপর্দক পর্যন্ত--সব আমি আজাদ হিন্দ ফান্ডে লিখে দিচ্ছি,-- -বিনিময়ে ঐ মালাখানি আমার চাই''হরগোবিন্দর দুচেখে বর্ষার ধারা....দেহ কাঁপছে....নেতাজীর চোখে আনন্দ...মঞ্চ থেকে নেমে এলেন,বুকে জড়িয়ে ধরলেন হরগোবিন্দকে....মালাখানি পরিয়ে দিতে গেলে হরগোবিন্দ বললেন==''আপনার গলায় মালা কি আমি গলায় পরতে পারি নেতাজী....আমার মাথায় রাখুন'' !!!ব্রিজলাল ছাড়তে চান না তার অধিকার...তাকে নেতাজী শান্তকরেন ,বলেন---বহু তো নঙ্গা ফকির বন চুকা ,ওর সঙ্গে তোমার আর লড়াই চলে না ভাই ,টাকা দিয়ে ভিখিরিকে ডিঙোনো যায় না ''এবার হরগোবিন্দ একটি আর্জি পেশ করল -- নেতাজী ,আর একটি ভিক্খা, --বলো হরগোবিন্দ- -আশ্বাস দিলেন নেতাজী....হরগোবিন্দ বললেন-- 'এখন গাছতলা ছাড়া আমার তো আর দাঁড়াবার স্হান রইল না , দিনে দু মুঠো গম ও তো চাই জীবন ধারনের জন্য,তাই আপনি আমাকে আশ্রয় দিন ,আজাদ হিন্দ ফৌজে ভর্তি করে নিন দয়া করে"